মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

বিপ্লব হালিম-এর

৭৩তম জন্মদিবস উদযাপন

ও

বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান প্রদান

(৩য় বর্ষ)

মুখবন্ধ

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা; প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতভাবে লাভ করেন; এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাস ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয় তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় অদ্য, ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।" (ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ)

ভারতীয় গণতন্ত্রের সারসংক্ষেপ, যা আমাদের সংবিধানের লিপিবদ্ধ তা মানুষের গণতন্ত্রের কথা বলে, সমান অধিকারের কথা বলে, বলে সুশাসন ও তাতে মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কথা। এরপরে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার আরো বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাতে তৃণমূল স্তর থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা তথা বিকাশের পথ সাধারণ মানুষ নিজেই নির্ধারণ করতে পারেন। সম্পূর্ণ না হলেও এই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় যেন গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজের অনুপ্রেরণার ছায়া দেখা যায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করার উদ্যোগ সমাজের সকল স্তরেই সমাদৃত হলেও এর বাস্তবায়নের পথে দেখা গেছে অনেক বাধা বিপত্তি, যার সাথে ওতো-প্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ও নানান অর্থনৈতিক স্বার্থ।

পশ্চিমবঙ্গতে বিগত দশকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আরো প্রসার হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পাশাপাশি এ রাজ্যের নতুন সংযোজন গ্রাম সভা। গ্রাম সভার সদস্য প্রতিটি গ্রামবাসী। আর গ্রামসভার কার্যকরী অনুশীলনে

প্রতিটি গ্রামবাসীই হয়ে উঠতে পারে ভবিষৎ ভারতের রূপকার। একই সাথে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরেও দলীয় প্রতীককেই সামনে রেখে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয়।

পঞ্চায়েত, বিশেষ করে গ্রামসভা যে দরিদ্র বঞ্চিত মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার লড়াইয়ের এক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, সত্যিই সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে, আজীবন এই বিশ্বাস ও স্বপ্ন চোখে পথ হেঁটেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রয়াত বিপ্লব হালিম।

তাঁর নিজের হাতে গড়া সামাজিক সংগঠন ইমসেতে তিনি ধারাবাহিক ভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তথা গ্রামসভাকে সক্রিয় ও কার্যকরী করার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, মহিলা সদস্যদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, একাধিক মডেল গ্রামসভা গঠন ও তাতে অংশ নিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি কাজের প্রচলন তিনি করেন, যার ধারাবাহিকতা এখনো তাঁর সহকর্মীরা রক্ষা করে চলেছেন। ইমসে থেকে পঞ্চায়েত নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রকাশিত হয়েছে অনেক পুস্তিকা। এছাড়াও পঞ্চায়েতের সাথে সম্পৃক্ত নীতি প্রণয়ন ও গবেষণার কাজে রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের বিশেষজ্ঞ মানুষদের সাথে তিনি নিয়মিত আলাপচারিতা করতেন ও রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য মতবিনিময়ের জন্য অনেক আলোচনা সভারও আয়োজন করেছিলেন তিনি। বিদেশের দরবারে, নানা আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায়, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ হিসাবে তিনি চিরকাল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদাহরণ টেনে গ্রামসভার সশক্তিকরণের কথা বলে গেছেন।

আজ ভারতীয় গণতন্ত্র এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন এ কথা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। দেশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, ধনী-গরীবের অর্থনৈতিক ফারাক বৃদ্ধি আজ আকাশচুম্বী। এক পরিসংখ্যান বলছে দেশের ১ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে ৭১ শতাংশ সম্পদ। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে দেশের অর্থনীতি আজ সব থেকে দুর্বল। প্রান্তিক মানুষেরা আজ সুশাসন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু থেকে নির্বাসিত। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, দলিত, মহিলা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের পায়ের নীচের মাটি আজ টলমান। তাদের আয়ের উৎসগুলির নির্লজ্জ বাণিজ্যকরণ একমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর আরো মুনাফা লাভের পথকেই প্রশস্ত করছে। সার্বিক উন্নয়নের নীতি নির্ধারণে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার

প্রতিফলনের ক্ষেত্র আজ সংকুচিত। বর্তমান কালে দাঁড়িয়ে, সংবিধানের আলোয়, যদি আমরা গণতন্ত্র অর্জনের ও তার প্রয়োগের মূল্যায়ন করি, তবে পরিস্থিতি খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। কিন্তু সংবিধানের দেখানো পথেই, যদি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে আরও জোরদার করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায়, তবে নিশ্চয় এক মজবুত গণতান্ত্রিক ভারত গঠনের পথে তা হবে সুদৃঢ় পদক্ষেপ, এমন এক গণতান্ত্রিক ভারত, যার বর্ণনা ধরা আছে সংবিধানের মুখবন্ধে; এমন এক দেশ আজীবন যার সাধনা করে গেছেন বিপ্লব হালিম ও তাঁর মত আরো বিশিষ্ট সমাজসেবী মানুষেরা।

এই ভাবনা থেকেই বিপ্লব হালিমের ৭৩তম জন্মদিবসে (১৯৪৭-২০১৭) এবারের স্মারক বক্তৃতা - 'আমাদের গণতন্ত্র ও অধরা পঞ্চায়েতী রাজ ঃ ফিরে দেখা' -র আয়োজন।

বিশ্বে তথা দেশে আজ যে অতিমারীর প্রকোপ চলছে, সেই কঠিন সময়ে আমাদের এই সভার আয়োজন একান্তই প্রযুক্তি নির্ভর। প্রধান বক্তা ড. বুদ্ধদেব ঘোষ মহাশয়কে মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সেই সব নিরলস সমাজসেবীদের যাদের হাতে 'বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান' তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। ধন্যবাদ সমস্ত সম্মানীয় অতিথিবৃন্দদের, যারা এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করেছেন আর শেষে ধন্যবাদ আমাদের সহকর্মীদের যাদের একনিষ্ঠ পরিশ্রমে ও ভালোবাসায়, বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা, এবার তৃতীয় বছরে পা দিল। আন্তরিকভাবে এই আলোচনাসভার সাফল্য কামনা করি।

উজ্জয়িনী হালিম
ইমসে

আমাদের গণতন্ত্র ও অধরা পঞ্চায়েতীরাজ ঃ ফিরে দেখা

বুদ্ধদেব ঘোষ

বিপ্লব হালিমের স্মৃতিতে আয়োজিত সভায় আমাকে পঞ্চায়েতী রাজ সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। যাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এই সভা, তাঁর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের প্রতি গভীর কৌতূহল এবং মমত্ববোধ ছিল। পঞ্চায়েত সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা হত মাঝে মাঝে। মনে আছে গ্রামসভা, গ্রাম সংসদের মধ্যে তিনি এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অনুশীলনের এই রকমের ক্ষেত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে? আজ সেসব কথা মনে পড়ছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মূলত, পঞ্চায়েত গণতন্ত্রের অনুশীলনে কী ভূমিকা পালন করতে পারত, কী ধরনের ভূমিকাই বা তাকে দিয়ে পালন করানো হয়েছে, পঞ্চায়েতের ভবিষ্যৎই বা কী এসব নিয়েই আজ আলোচনা করতে চাই।

গণতন্ত্রের দুই ইতিহাস ঃ

গণতন্ত্রের দুইটি আদল আছে। প্রথমটির উদ্ভাবনা ঘটেছিল গ্রিসের নগররাষ্ট্র এথেন্সে খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর আগে। ডেমোক্রেসি কথাটা এসেছে গ্রিক শব্দ ডেমোক্রেসিয়া (Demokratia) থেকে। এই শব্দটি দুইটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিতঃ একটি হল 'ডেমস্' অর্থাৎ জনগণ এবং আরেকটি 'ক্রাটোস্' অর্থাৎ ক্ষমতা। তাই গ্রিক গণতন্ত্র হল 'রুল বাই ডেমস্' অথবা 'জনগণের দ্বারা চালিত শাসন'। এথেন্সের গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল জনগণের শাসনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন 'গরিব' কথাটি কারণ তারাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং এথেন্সের গণতন্ত্র ছিল গরিব জনগণের শাসন।

এথেন্সের গণতন্ত্রকে যখন জনগণের বা সাধারণ মানুষের শাসন বলে অভিহিত করা হয়, তখন তা আক্ষরিক অর্থেই সত্য। অর্থাৎ এথেন্স শাসিত হত রেফারেণ্ডামের মত একটি প্রক্রিয়া দ্বারা, যেখানে জনসাধারণের সবাই (অবশ্য দাস, নারী এবং বিদেশীরা বাদে) একটি সভায় উপস্থিত হয়ে আলোচনা এবং ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন। এই সভা ঘন ঘন হত। এথেন্সের গণতন্ত্র তাই ছিল প্রত্যক্ষ বা ডাইরেক্ট গণতন্ত্র। এই গণতান্ত্রিক শাসন বহুদিন চালু ছিল। রোমানদের গ্রিস বিজয়ের পর গণতন্ত্র অস্তাচলে গেল।

এরপরে গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয় উদারপন্থার হাত ধরে, প্রথমে ইংল্যান্ড এবং পরে আমেরিকায় এবং তারপর অন্যত্র। ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা থেকে যাত্রা শুরু করে ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব নামে পরিচিত প্রজা অভ্যুত্থানের সময়কালে, ইংল্যান্ড উদারপন্থী গণতন্ত্রের মূল নীতিগুলি প্রণয়ন করে ফেলেছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাজনীতি দর্শনের দুই শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ টমাস হব্‌স এবং জন লক্ এই সময়কালেই ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মূলত লকের লেখাতেই উদারপন্থার মূল নীতিগুলি রূপ পায়। এগুলো হল সংবিধান নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র, আইনের শাসন, সরকারের ক্ষমতার সীমবদ্ধতা, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার ইত্যাদি। এর সঙ্গে যুক্ত হল কিছু গণতান্ত্রিক নীতি - পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, পার্লামেন্টের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা এইসব এবং পরবর্তীকালে অর্জিত সর্বজনীন ভোটাধিকার - এসব মিলেই হল আজকের উদারপন্থী গণতন্ত্র যার বিশ্বজয়ের পূর্ণরূপ আমরা দেখতে পেয়েছি বিংশ শতাব্দীতে।

কিন্তু যে গণতন্ত্র বিশ্বজয় করল, তা গ্রিসের গণতন্ত্র নয়। উদারপন্থী গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আইন যাঁরা প্রণয়ন করেন এবং সরকার যাঁরা চালনা করেন, তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণের হাতে নয়, জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে। আব্রাহাম লিঙ্কন যতই বলুন গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের সরকার, জনগণ চালনা করেছেন এমন সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার, তবুও জনগণের সাথে রাষ্ট্রের একটা দূরত্ব থেকেই যাচ্ছে, কারণ মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন জনগণের প্রতিনিধিরা। ফরাসী দার্শনিক রুশো তাই বলেছিলেন ইংল্যান্ডের জনগণ তাঁদের স্বাধীনতা (Liberty) উপভোগ করতে পারেন পাঁচ বছরে একবার, পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের নির্বাচনের সময়।

ডেমোসের সাথে রাষ্ট্রের এই দূরত্ব উদারপন্থী গণতন্ত্রের একটা বড় ত্রুটি হিসাবেই বিবেচিত হয়। রুশোর মতে গণতন্ত্রে সর্বসাধারণের ইচ্ছা বা 'general will' সমস্ত আইনের ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু পার্লামেন্ট কখনও কখনও এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা আংশিক জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন, সর্বসাধারণের না। এমন অবস্থা হলে প্রশ্ন উঠবেই, প্রকৃত গণতন্ত্র একমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেই সম্ভব, যা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সম্ভব নয়।

এই কারণেই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সংস্কারের কথা উঠলেই নাগরিকের অংশগ্রহণের কথা ওঠে। উদারপন্থায় জনগণের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় নাগরিক হিসাবে শুধু তাঁদের অধিকারগুলি ভোগ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত গণতন্ত্র নাগরিকের নিষ্ক্রিয়তা নয়, সক্রিয়তা দাবি করে। রাষ্ট্রশাসনে নাগরিকের অংশগ্রহণও কামনা

করে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে একটা বড় রাষ্ট্রে তা কি করে সম্ভব হয়? এথেন্স-এর মত নগররাষ্ট্রে যা সম্ভব ছিল, তা কি বড় রাষ্ট্রে সম্ভব? এই সমস্যার সমাধান দিয়েছেন উদারপন্থী গণতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা। তাঁরা বলেছেন যে গণতন্ত্রের মর্মবস্তু হল 'আলাপ-আলোচনা'-র মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা। এই নীতি যদি রূপায়ণ করা যায়, তাহলে জনগণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সর্বসাধারণের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গড়ে ওঠে নানা সংগঠন, এর মধ্যে থাকতে পারে রাজনৈতিক দল বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়, গণমাধ্যম ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মত সংগঠন। এরা রাষ্ট্রনৈতিক বা সর্বসাধারণ জীবনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক এমন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। যেখানে গণতন্ত্র মজবুত অর্থাৎ যেখানে সরকার বিশ্বাস করে যে সরকারি সিদ্ধান্তে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে - সেখানে এই ধরনের আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া হয় এবং আলোচনা যাতে খোলামেলা পরিবেশ হতে পারে তার জন্য নাগরিকের বাক্স্বাধীনতার অধিকার সুরক্ষিত রাখা হয়। সর্বস্তরে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা যেখানে গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত রচনা করে, সেখানে সরকার অনেক বেশি জনমুখী হয়।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সরকার নাগরিকের অংশগ্রহণের মাত্রা অনেকটাই বৃদ্ধি করতে পারে সন্দেহ নেই। তবে সরকার যে স্তরে অবস্থিত, তা নাগরিকদের থেকে নিকট না দূরে, তার উপরও নির্ভর করে অংশগ্রহণের মাত্রা। যে স্তরের সরকার নাগরিকদের থেকে সব চাইতে দূরে, তা হল কেন্দ্রীয় সরকার। আর যে সরকার সব চাইতে কাছে তা হল স্থানীয় সরকার অর্থাৎ গ্রাম বা শহর স্তরের সরকার। জনগণের সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য এই সরকারের দ্বারা সর্বদাই উন্মুক্ত রাখা যায়। এমন কি, গ্রামসভার মত মঞ্চের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার চালানোতেও জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানটি উদ্ভাবিত হয়েছিল ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়। তারপরে অন্যান্য দেশেও স্থানীয় সরকার শাসন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়। নামেই স্পষ্ট, স্থানীয় সরকার হল স্থানীয় স্তরের সরকার। আমেরিকার পরিপ্রেক্ষিতে তা পুরসভা। ইংল্যান্ডে আছে কাউন্টি কাউন্সিল। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের দুইটি শর্ত পালন করে স্থানীয় সরকার। এক, সরকারি ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের পথ রুদ্ধ করে। দুই, জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিক থেকে দেখলে, যতটা গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের সান্নিধ্যে কোনও নাগরিক তাঁর স্বাধীনতার মর্ম অনুভব করতে পারেন, তেমনটা উচ্চস্তরের সরকারের ক্ষেত্রে পারেন না। এই কারণেই

আমেরিকার গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক আলেক্সিস দ্য তোকভিল্ বলেছিলেন একটি জাতি স্বাধীন সরকার স্থাপনের সব ব্যবস্থাই করতে পারে, কিন্তু সেখানে যদি পুরসভার মত প্রতিষ্ঠান না থাকে তাহলে স্বাধীনতার মর্মই অনুভব করা যায় না।

পঞ্চায়েতী রাজঃ

পঞ্চায়েত (এবং পুরসভা) আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার। সংবিধানে স্থানীয় সরকার হিসাবে তাদের স্বীকৃতি আছে। মুশকিল হচ্ছে এই যে এই স্বীকৃতি এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে যায়। ভুল বোঝাবুঝি দুই কারণে। প্রথমত, যদিও পঞ্চায়েতকে সরকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তার প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধিকারের বিষয়গুলি নিয়ে স্পষ্ট কথা বলেনি সংবিধান, বরং এই বিষয়গুলির উপর সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জন্মকাল থেকেই আমাদের সংবিধান একটি দ্বি-স্তর ফেডারেশন। এখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আছে। যদি পঞ্চায়েতকে স্থানীয় অথবা তৃতীয় স্তরের হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, তাহলে আমাদের ফেডারেশন শুধু দুই স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ত্রি-স্তর হয়ে যায়। সংবিধান স্পষ্ট করে তা বলে না। দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (Administrative Rerform Commission) যখন সুপারিশ করে যে সংবিধান সংশোধন করে পঞ্চায়েতের স্বাধিকারের প্রশ্নটি ঘিরে যে ধোঁয়াশা আছে তা পরিষ্কার করে দেওয়া হোক, তখন ভারত সরকার সরাসরি তা নাকচ করে দেয়।

এইসব কারণে আমাদের পঞ্চায়েত ইংল্যান্ড বা আমেরিকার স্থানীয় সরকারের মত গড়ে ওঠেনি। আমাদের যে পঞ্চায়েত চালু আছে, তার আদলটি কলোনিয়াল ভারতের স্থানীয় সরকারের মত, যাদের জেলাশাসক এবং অন্যান্য আমলাদের নজরদারিতে কাজ করতে হতো, যাদের স্বাধিকার খুবই সামান্য ছিল। অন্যদিকে, পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে একটি শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মৌলিক চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন গান্ধীজি।

গান্ধীজি তাঁর দেশবাসীর জন্য যে সমাজের স্বপ্ন দেখতেন, সেখানে ব্যক্তি সবদিক থেকেই মুক্ত এবং স্বাধীন। সে সামাজিক অসাম্যের বলি নয়। অর্থনৈতিক শোষণ তাকে স্পর্শ করে না এবং রাজপুরুষের উদ্ধত ও অন্যায় আচরণের হাত থেকে সে মুক্ত। এইরকম একটা সমাজের শাসন ব্যবস্থার যে কাঠামো, তা পিরামিডের মত নিচুতলাটা বড় এবং উঁচুতলাটা সরু নয়। কারণ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রে ঘনীভূত হয় না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। ভারতের (এখানে অবিভক্ত ভারতের কথা

বলা হচ্ছে) সাত লক্ষ গ্রামে থাকতে পারে সাত লক্ষ নির্বাচিত পঞ্চায়েত। ধারণাগতভাবে তাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। কিন্তু রাষ্ট্রের সব ধরণের কাজের দায়িত্ব গ্রামের পঞ্চায়েতের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। সেইসব কাজের দায়িত্ব চলে যাবে পরের উচ্চ ধাপের পঞ্চায়েতে, হয়ত জেলায়। এমনি ভাবে জেলা পঞ্চায়েতের থেকে রাজ্য সরকারের হাতে এবং সেখান থেকে কেন্দ্রে। উঁচুতলার সরকারের বড় দায়িত্ব নিতে হবে ঠিকই, ক্ষমতাও তাদের বেশি থাকতে, কিন্তু তাঁদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে এই ক্ষমতা তাদের নিজেদের না, এটা তাদের হাতে অর্পণ করেছে নিচুস্তরের সরকার এবং এইভাবে শেষপর্যায়ে পঞ্চায়েত। ধারণাগতভাবে সব ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অথবা জনগণের। সেই ক্ষমতাই পরের বড় স্তরের সরকারকে ক্ষমতায়ন করে এবং এই ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া চলে জাতীয় সরকার পর্যন্ত - নিচু থেকে উঁচুতে যায় ক্ষমতা, নিচুর সম্মতি সাপেক্ষে।

স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় এক স্তরের ক্ষমতা-কেন্দ্রের সাথে আরেক স্তরের কেন্দ্রের সম্পর্ক হায়ারর্কির নয়, বরং কয়েকটি সামুদ্রিক (oceanic) অথবা সমকেন্দ্রিক (Concentric) বৃত্তের মত। ক্ষমতার কেন্দ্র যে স্তরেই থাকুক, সেই ক্ষমতার উৎস একই কেন্দ্রবিন্দুতে অর্থাৎ সাত লক্ষ গ্রামের জনগণের কাছে। এইরকম একটা শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে জাতীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনের চাইতেও বেশি ক্ষমতা থাকার কথা হয় না। অর্থাৎ, বর্তমান অবস্থায় যেমন গ্রামে শৌচালয় স্থাপনের প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করে, তেমনটা হবে না। স্ব-নির্ভর গ্রাম ও জেলার মধ্যেই অনেক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ সম্ভব। সেইসব স্তর যেহেতু পঞ্চায়েত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ জনগণের হাতেই অনেকটা থাকবে। আর তা হলেই সাধারণ মানুষ তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বরাজ খুঁজে পাবে। গান্ধীজির পঞ্চায়েত রাজের উদ্দেশ্য ছিল এমনই একটি বিকেন্দ্রীভূত এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করা, যেখানে ব্যক্তিই স্থির করবে সে কিভাবে, কতটা এবং কার দ্বারা শাসিত হবে। যে শাসনব্যবস্থা এমনই ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাকেই তিনি প্রকৃত গণতন্ত্র বলেছেন। এই প্রেক্ষিত থেকেই তাঁর গ্রাম স্বরাজের ধারণাকে বুঝতে হবে।

এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার পর যখন নতুন সংবিধান রচিত হচ্ছিল, তখন সংবিধান প্রণেতারা ভারতবর্ষে কি করে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত অগণিত দেশবাসীকে কীভাবে প্রকৃত স্বাধীনতার মর্মবস্তুর সাথে পরিচিতি করানো যায় - এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত ছিলেন না। গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজের প্রকল্প নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার ধৈর্য তাঁদের ছিল না। পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কিছু মডেল ছিল তাঁদের মনোযোগের বস্তু। তাঁরা শেষ পর্যন্ত এমন একটা শাসনকাঠামো

তৈরি করলেন, যা হল আকারের দিক থেকে যুক্ত রাষ্ট্রীয় (federal) ব্যবস্থা, কিন্তু মর্মবস্তু বিচার করলে, তাকে এককেন্দ্রিক (unitary) ব্যবস্থা বলে মনে হয়। অর্থাৎ কেন্দ্র এবং রাজ্যের ক্ষমতা বন্টনে, কেন্দ্রের দিকটাই একটু বেশি ভারি। উদারপন্থী গণতন্ত্রের যেসব মডেলের অনেক নীতি আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই স্থানীয় সরকারের নীতিও ছিল। কিন্তু স্থানীয় স্তরে সরকার স্থাপন করা এবং তাঁর ক্ষমতায়ন করার কোনও চিন্তাই সংবিধান প্রণেতারা করেন নি। হয়ত সেই কারণেই গান্ধীজির পঞ্চায়েত রাজ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ আদায় করতে পারেনি। ওঁরা এদেশে উদারপন্থী এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর জন্য একদিকে তাঁরা যেমন প্রয়োজনীয় কাঠামো, যথা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আইনসভা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অন্যদিকে উদারপন্থী এবং গণতন্ত্রের কিছু নীতি রূপায়ণ করেছিলেন যেমন আইনের শাসন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, সরকার, আইনসভা এবং বিচারব্যবস্থার ক্ষমতার পৃথক্করণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যে একটা শূণ্যস্থান ছিল, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব, সেই সম্পর্কে তাঁদের বোধের অভাব ছিল বলে মনে হয়। গণতন্ত্রের প্রসারতা ও গভীরতা প্রদানের জন্য যে বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা এবং নির্বাচিত ও ক্ষমতা সম্পন্ন পঞ্চায়েত/পুরসভার প্রয়োজন - এই বোধ তদানীন্তন নেতৃবর্গের না হওয়াটা ছিল আমাদের আদি পাপ। এই পাপ এখনও আমাদের তাড়া করে বেড়ায়।

সংবিধান প্রণয়নের সময় না হোক, পরবর্তীকালে বেশ কয়েকবার কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। যদিও প্রচারে বলা হয়েছিল যে পঞ্চয়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা হলে, ক্ষমতা সরাসরি যাবে জনগণের হাতে, কার্যত এসবের কিছুই হয়নি। কারণ জনগণের হাতে ক্ষমতা দিতে গেলে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রয়োজন হয় এবং পঞ্চায়েতকে একদিকে স্বশাসিত করতে হয়, অন্যদিকে তাকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করতে হয়। কিন্তু এসব কিছু করা হয়নি। ফলে সংবিধানে স্থান করে দেওয়া সত্ত্বেও, পঞ্চায়েত স্থানীয় সরকার হিসাবে প্রস্ফুটিত হতে পারেনি। এই কাহিনীটি সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রকল্প ও অধরা পঞ্চায়েতী রাজঃ

ব্রিটিশ শাসনে স্থানীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। স্থাপিত হয়েছিল পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন বোর্ড এবং ডিস্ট্রিক বোর্ড-এর মত প্রতিষ্ঠান। ক্রমাগত অবহেলায়, সেইসব প্রতিষ্ঠান নির্জীব হয়ে পড়েছিল।

যদিও সংবিধানে পঞ্চায়েত ছিল রাজ্যের বিষয়, সারা ভারতে পঞ্চায়েতী রাজ পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা নেয় কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে। ১৯৫২ সালে শুরু হয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম গ্রামোন্নয়নের উদ্যোগ, যার নাম ছিল সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Community Development Project)। এই প্রকল্পের কাজ কী রকম হচ্ছে, তাদের কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সমস্যার সমাধানের উপায় কী হতে পারে - ইত্যাদি বিষয়ে নিরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে ভারত সরকার। এই কমিটির শীর্ষে ছিলেন গান্ধিবাদী নেতা বলবন্তরায় মেহতা। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পর্যবেক্ষণের পর এই কমিটি যে সিদ্ধান্তে আসে তা ছিল এরকম, এই প্রকল্প নিয়ে উৎসাহ শুধু কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের আছে, কিন্তু যাঁদের জন্য এই প্রকল্প - গ্রামবাসীরা তাঁদের মধ্যে কোনও উৎসাহ ও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। যদি গ্রামের মানুষ এই প্রকল্পের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন না করেন, এর সাফল্যের জন্য উদ্যোগ না নেন, তবে এই উন্নয়ন প্রকল্প কখনই সফল হবে না। যতদিন না আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান আবিষ্কার করি যা গণতান্ত্রিক এবং গ্রামীণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে এবং তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং অর্থসংস্থান দ্বারা উপযুক্ত করে না তুলি, ততদিন আমরা কিছুতেই স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ও উদ্যোগের দেখা পাবো না। মেহতা কমিটির এই সিদ্ধান্ত ভারত সরকার মেনে নেয় এবং তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সমর্থনে সব রাজ্যে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। একে আমরা প্রথম প্রজন্মের পঞ্চায়েতী রাজ বলে অবিহিত করে থাকি। নেহেরুর উৎসাহে এর সৃষ্টি, নেহেরুর মৃত্যুর পর দুই একটি রাজ্য বাদে, প্রায় সব রাজ্যে এই পঞ্চায়েতের মৃত্যু ঘটেছিল। নেহেরুর ধারণা ছিল যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত চালু হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আর কেন্দ্রীভূত থাকবে না, জনগণের হাতে ক্ষমতা যাবে, যেমনটা গান্ধীজী চেয়েছিলেন, তা হয়নি। তার কারণ ঐ পঞ্চায়েতের সৃষ্টিই হয়েছিল সরকারের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে, গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নয়। পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতায়নের কোন উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। ফলে যখনই উচ্চস্তরের সরকার পঞ্চায়েত সম্পর্কে নিরুৎসাহ হল, তখনই প্রতিষ্ঠানটি নির্জীব হয়ে পড়ল।

পঞ্চায়েতী রাজের আবার সুদিন ফিরল ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৭ সালে যে নির্বাচন হল, তাতে কংগ্রেস হেরে গেল এবং জনতা দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় এল। এরা বললেন যে পঞ্চায়েতী রাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে। এই বিষয়ে যথাযথ নীতি প্রণয়নে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তাঁরা একটি কমিটি গঠন করলেন যার মাথায় থাকলেন সমাজবাদী

নেতা অশোক মেহতা। পঞ্চায়েত সম্পর্কে যে যান্ত্রিক ধারণা প্রথম প্রজন্ম পঞ্চায়েতের সময়কালে চালু হয়েছিল - অর্থাৎ গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য পঞ্চায়েতের প্রয়োজন - তা অশোক মেহতা কমিটিকেও প্রভাবিত করেছিল। তারা পঞ্চায়েতী রাজের পুনর্গঠন প্রয়োজন - এই মর্মে সুপারিশ করেছিলেন। তার কারণ গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি অর্থ বরাদ্দ বেড়ে গেছে এবং পঞ্চায়েতের মত প্রতিষ্ঠান না থাকলে তার সুষ্ঠ রূপায়ণ সম্ভব হবে না। গণতন্ত্র বা রাষ্ট্র শাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিয়ে তাঁরা ভাবিত ছিলেন না।

কিন্তু অশোক মেহতা কমিটির অন্যতম সদস্য, বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ মহাশয় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে একমত হতে না পেরে একটি ভিন্ন প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। এই প্রতিবেদনটি স্থানীয় স্তরের গণতান্ত্রিক শাসনের যে রূপরেখা নির্ণয় করে দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে মুল্যাতীত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই দেশের রাজনৈতিক ডিসকোর্সে স্থানীয় গণতন্ত্র এখনও স্থান করে নিতে পারেনি। সেই কারণে নাম্বুদিরিপাদ এর প্রতিবেদনটি যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এর মূল বক্তব্য ছিল যে পঞ্চায়েতকে দেখতে হবে স্থানীয় স্তরের সরকার হিসেবে। সেই প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত হবে দেশের সার্বিক শাসনকাঠামোর অঙ্গ। সুতরাং পঞ্চায়েত শুধু উন্নয়নের কাজই করবে, কথাটার কোনও অর্থ হয় না। শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে তার কাছে কিছু প্রশাসনিক কাজ করার, কিছু সেবা দেবার দায়িত্ব থাকবে। তার মধ্যে কিছু হতে পারে উন্নয়নের কাজ, কিছু হতে পারে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমূলক কর্ম। শেষে উল্লিখিত শ্রেণীর কোনও কাজের দায়িত্ব পঞ্চায়েতকে দেওয়া যাবে না এমন কোনও বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। "যা প্রয়োজন তা হল এই যে কিছু কর্মের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। বাকি সব বন্টিত হয়ে যাবে প্রথমে রাজ্য সরকারে এবং তারপর জেলা ও অন্যান্য নিচু স্তরের শাসন কেন্দ্রগুলির হাতে"। অর্থাৎ স্পষ্টতই তিনি সওয়াল করছেন শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে এবং সেই প্রেক্ষিতে তাঁর আশা এই যে জেলা ও তার নিচের স্তরে শক্তিশালী ও ক্ষমতা সম্পন্ন স্থানীয় সরকার স্থাপিত হবে।

গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজের প্রকল্প বাস্তবায়িত করা সহজ নয়। অন্যদিকে নাম্বুদিরিপাদের যে সুপারিশ ছিল তা কিন্তু আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই স্থানীয় স্তরের স্বশাসিত ও ক্ষমতা সম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠা করার প্রকল্প। এই সুপারিশের রূপায়ণ কঠিন ছিল না। শুধু প্রয়োজন ছিল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, যাতে আমাদের দ্বি-স্তরীয় ফেডারেল ব্যবস্থা বহুস্তরীয় ফেডারেল ব্যবস্থায় পরিণত হতে পারে এবং কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরের সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুষম বন্টন হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিষয়ে

যে ধরণের চিন্তাধারার আধিপত্য ছিল (এবং এখনও আছে), তাদের সরিয়ে স্বশাসিত এবং ক্ষমতাশালী স্থানীয় সরকারের ভাবনা স্থান করে নিতে পারে নি।

হয়ত, এই কারণেই আরও দুইবার পঞ্চায়েতী রাজ পুনর্গঠনের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হলেও, স্বশাসিত এবং ক্ষমতাশালী পঞ্চায়েতের ভাবনা অধরা থেকে যায়। প্রথম উদ্যোগটি নিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী। ১৯৮০-র দশকে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি জেলা এবং তালুক/গ্রাম স্তরের প্রশাসনের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে লক্ষ করেন যে এই স্তরের সরকারী প্রশাসন অসংবেদনশীল, কারণ প্রশাসন চালায় শুধুমাত্র আমলারা যাদের কাজ তদারকি করার জন্য জনগণের সেই স্তরের কোনও প্রতিনিধি থাকে না। তিনি উপলব্ধি করলেন জেলা এবং গ্রামস্তরে যদি গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে সাধারণ মানুষ কখনও গণতন্ত্রের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন না। এই উপলব্ধি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করে দিল। তাঁর এই প্রতীতি হল যে গণতন্ত্রকে প্রসারিত করতে গেলে স্বশাসিত পঞ্চায়েত ও পুরসভাকে দেশের প্রশাসনের অঙ্গীভূত করতে হবে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মত স্থানীয় স্তরের সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এটা করতে গেলে সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন হয়। তাই তিনি পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধনী বিল আনলেন যা ৬৪তম সংবিধান সংশোধন বিল নামে পরিচিত। বিলটি রাজ্য সভায় পাশ করানো যায়নি। ফলে পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেবার জন্য রাজীব গান্ধীর প্রচেষ্টা বিফলে গেল। অবশ্য স্বল্পকাল পরেই ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চায়েত ও পুরসভা সম্পর্কিত আরও দুইটি সংবিধান সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে পাশ হয় যা বর্তমানে ৭৩তম এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। দুঃখের কথা হল এই যে আমাদের শাসনব্যবস্থায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা সম্পর্কে রাজীব গান্ধীর স্বচ্ছ এবং প্রগতিশীল ধারণা থাকা সত্ত্বেও ৬৪তম এবং ৭৩তম সংবিধান বিলগুলির কোনওটাতেই সেই সব ধারণা প্রতিফলিত হয়নি। অর্থাৎ স্বশাসিত এবং ক্ষমতাসম্পন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করার কোনও উদ্দেশ্য এই দুই সংশোধনী বিলেও ছিল না। বরং রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি হিসেবে এইসব সরকারের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণ করার যে ভূমিকা প্রথম প্রজন্মের পঞ্চায়েতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তাই ৭৩তম সংবিধান সংশোধনে এসেও কার্যত বহাল রইল। পঞ্চায়েতকে কতটা স্বাধিকার দেওয়া হবে, তা স্থির করার ভার আবার দেওয়া হল রাজ্যের আইনসভাকে।

তাহলে সংবিধান সংশোধন কী পরিবর্তন আনল? প্রথম পরিবর্তন পঞ্চায়েতকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। সংবিধান সংশোধনের পূর্বে পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব অথবা

সময়মত এর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা নির্ভর করত রাজ্য সরকারের মর্জির উপর। এখন আর তা আইনত সম্ভবপর না। দ্বিতীয় পরিবর্তন হল পঞ্চায়েতের জন্য বিশেষ কয়েকটা সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে দেওয়া, যেমন রাজ্য নির্বাচন কমিশন, রাজ্য অর্থ কমিশন ইত্যাদি। তৃতীয় পরিবর্তন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে নিম্নবর্গের মানুষ এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিকর বা inclusive হয়েছে। পঞ্চায়েত যে স্বশাসিত সংস্থা তাঁর স্বীকৃতিও সংবিধানে আছে। কিন্তু যা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়নি তা হল ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা অর্থাৎ, রাজ্য সরকারের কিছু ক্ষমতা পঞ্চায়েতে ন্যস্ত করার বিষয়।

সংক্ষেপে এই হল আমাদের দেশের পঞ্চায়েতের ইতিহাস। এরই প্রেক্ষিতে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি আমাদের রাজ্যের পঞ্চায়েতের অতীত ও বর্তমান অবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতঃ

বলবন্ত রায় কমিটির রিপোর্টের পর যখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী রাজ চালু হয় তখন পশ্চিমবঙ্গ খুব একটা উৎসাহ দেখায় নি। ১৯৬২ সালে যখন গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন, তখন তাঁর উৎসাহে গ্রাম, ব্লক ও জেলা স্তরে পঞ্চায়েত স্থাপিত হয় ১৯৬৪ সালে। কিন্তু নতুন প্রতিষ্ঠানগুলি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই তদানীন্তন সরকারের পতন হয় এবং পরবর্তীকালের সরকারের ক্রমাগত অবহেলা প্রদর্শনের কারণে কালক্রমে পঞ্চায়েতগুলির প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যায়। এরপরে পঞ্চায়েতী রাজের পুনর্জাগরণ ঘটে ১৯৭৮ সালে যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায়। তারপর প্রায় সাড়ে তিন দশকের সময়কালকে বাংলার পঞ্চায়েতী রাজের সবচাইতে ভালো সময় বলা যায়।

১৯৭৮ সালে বাংলায় যখন পঞ্চায়েতী রাজের সূচনা হয় তখন তা এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল, কারণ সেই সময়ে দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। আরও একটি কারণে এই পঞ্চায়েতী রাজ বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। রাজ্যের পঞ্চায়েত আইনে পরিবর্তন এনে, গ্রাম, ব্লক ও জেলার সব স্তরের পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হলেন সরাসরি জনগণের ভোটে। পূর্বে জেলা ও ব্লক পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হতেন অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। কার্যভার গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই নতুন পঞ্চায়েতগুলির হাতে কাজের বদলে খাদ্য, গ্রামীণ জল সরবরাহ ইত্যাদি প্রকল্প রূপায়ণের ভার তুলে দেওয়া হল। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তগুলি ছিল এক অভিনব পদক্ষেপ। কারণ, সরকারি আমলাদের ক্ষমতাগুলি যে পঞ্চায়েত নামক একটি অর্বাচীন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া যায় - এমন

চিন্তাই তখন কেউ করতেন না। ক্রমে ক্রমে গ্রামোন্নয়নের বহু প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব পঞ্চায়েতকে দেওয়া হল। ফলে পঞ্চায়েতে অর্থের যোগানও বাড়তে লাগল। ১৯৭৮-৭৯ সালে পঞ্চায়েতের হাতে আর্থিক সম্পদ আসত আনুমানিক ২০ কোটি টাকা, ২০০৯-১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০০০ কোটি টাকায়। ক্রমশ পঞ্চায়েত গ্রামীণ মানুষের কাছে অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল।

গ্রামোন্নয়নের কাজে পঞ্চায়েতকে যুক্ত করার সুফল অচিরেই পাওয়া গেল। ১৯৮০-র দশক থেকে দারিদ্র নিরসনের জন্য ভারত সরকার নানা প্রকল্প গ্রহণ করল। এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণে সব চাইতে বড় সমস্যা ছিল প্রকৃত দরিদ্রদের চিহ্নিত করা এবং তাঁদের কাছে প্রকল্প থেকে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া। এই কাজের দায়িত্ব পঞ্চায়েতকে দেওয়া হল। বিভিন্ন গবেষক, বিভিন্ন সময়ে সমীক্ষা করে দেখেছেন যে গরিবদের জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধাগুলি এ রাজ্যে গরিবদের কাছেই পৌঁছেছে।

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এবং এই পঞ্চায়েতের হাতে কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং জল সরবরাহ প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ থাকায়, গ্রামের রাস্তাঘাট, পুকুর সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটল অল্প দিনের মধ্যেই। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকায়, শাসক দলের সমর্থন দরিদ্র ও নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি থাকায় এবং সর্বোপরি পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণ থাকায়, বেশ কিছু অবহেলিত শ্রেণীর মানুষ পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে উঠে এসেছিলেন।

স্থানীয় গণতন্ত্রের প্রসারে এবং গ্রামোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরেছিল পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত। তবুও যে প্রশ্নটা তোলা জরুরী ছিল এবং অতীতে যে প্রশ্নটা কেউ কেউ তুলেও ছিলেন, তা হল এই যে পঞ্চায়েতের ভিতর যা সম্ভাবনা ছিল তার কি যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়েছে? অনেকেই মনে করেন তা হয়নি। এ রাজ্যে যে ধরণের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছিল তাকে বলা যায় আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ। কারণ পঞ্চায়েতের স্বাধিকার বা অটোনমি ছিল সীমিত। কোনও নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক অথবা পরিষেবা প্রদানের প্রশাসনিক কাজের পুরো দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় নি। প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে রাজ্য সরকারের এজেন্সি হিসেবে। সরকার যেমন কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করে দেয়, তাই একে মেনে নিতে হয়। বাস্তব অবস্থা এমন যে সরকারি আদেশনামা না পেলে পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয় না। এ কথা বলার অর্থ এই যে নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের উপর পঞ্চায়েতের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এর একটি কারণ যেমন রাজ্য থেকে পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করা, তেমনি আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের (fiscal

decentralization) উদ্যোগ না নেওয়া। পঞ্চায়েতের হাতে অনেক টাকা, কিন্তু তার ৮০-৮৫ শতাংশ টাকাই প্রকল্প ভিত্তিক টাকা এবং শর্তাধীন। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য অর্থ কমিশন যে টাকা দেয়, তা পঞ্চায়েতের হাতে আসে শর্তাধীন হয়ে। পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে আর্থিক ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত উচ্চ স্তরের সরকারের উপর নির্ভরশীল।

মোট কথা প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধিকার দিয়ে পঞ্চায়েতকে স্বশাসিত স্থানীয় সরকার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়নি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিকেন্দ্রীকরণকে আমরা আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ বলে অভিহিত করছি। তার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য রাজ্য এর চেয়ে বেশি কিছু করেছে। বরং এটা নিশ্চয়ই বলতে হবে যে এই রাজ্যে পঞ্চায়েতকে যতটা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, কেরালাকে বাদ দিলে অন্য কোনও রাজ্য তার কাছাকাছিও আসতে পারেনি। আক্ষেপ এই যে বিকেন্দ্রীকরণের পথে অনেক দূর এগিয়েও পশ্চিমবঙ্গ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারল না। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের ভিতর যে সম্ভাবনা ছিল, তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হল না।

২০১১ সালে বামপন্থীরা ক্ষমতা থেকে সরে গেল। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এল। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকবর্গকে হটানো এবং তার জায়গায় নতুন কোনও দলের হাতে শাসনভার তুলে দেওয়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা। তার অর্থ এই নয় যে অতীতে যা কিছু হয়েছে, তা বাতিল করতে হবে। বরং পূর্বতন সরকার যদি একটা কোনও ভালো নীতি অনুসরণ করে থাকে, তবে পরবর্তী শাসকের কর্তব্য সেই নীতিকে পরিবর্তন না করে পূর্বের ভুল ভ্রান্তিগুলিকে সংশোধন করা। পরিবর্তনের পর পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী রাজ আরও উন্নত স্তরে আরোহন করবে, এই আশা রাখাটাই সমীচীন ছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তবে ঘটলো উল্টো। পরিবর্তনের পর প্রথমেই আঘাত নেমে এল সেইসব পঞ্চায়েতগুলির উপর যেগুলি ছিল বামপন্থীদের দখলে। তাঁদের সাথে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠল। ক্রমে ক্রমে সব পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকেই বুঝিয়ে দেওয়া হল যে উন্নয়নের কাজে এর পর থেকে পঞ্চায়েতের ভূমিকা হবে গৌণ। জেলাশাসক এবং সরকারি আধিকারিকরাই উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের মূল দায়িত্বে থাকবেন।

তিন দশকের বেশি কাল ধরে যে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে, তার গুরুত্ব হ্রাস করতে বেশি সময় লাগল না। সরকারি নীতির এত বড় পরিবর্তন প্রথমে করা হল শুধুই মৌখিক নির্দেশের মারফৎ। তারপর মাস ছয়েকের মধ্যে জারি হল সরকারি আদেশনামা, যেখানে বলে দেওয়া হল উন্নয়ন কার্যের মূল দায়িত্বে

থাকবেন আমলারা - ডি.এম, এস.ডি.ও, বি.ডি.ও ইত্যাদি। পঞ্চায়েতের কাজের তদারকি করাও এঁদের দায়িত্ব। অর্থাৎ নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের কাজের উপর নজরদারি করবে স্থানীয় আমলারা। এই আদেশনামাটি শুধুই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিল না, ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের নীতির বিরোধীও ছিল। পঞ্চায়েত-বিরোধী আদেশনামার আরও একটি নিদর্শন পাওয়া গেল আরও তিন-চার মাস পরে। চারটি জেলা পরিষদের আর্থিক ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল জেলা শাসকের হাতে, যিনি কিনা জেলা পরিষদের প্রশাসনিক আধিকারিক। অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, তা দেওয়া হল একজন আমলার হাতে যিনি পদমর্যাদায় সভাধিপতির অধীনস্থ কর্মচারী। একমাত্র কলোনিতে এই ধরণের আদেশনামা জারি হতে পারত, কোনও গণতান্ত্রিক দেশে নয়।

প্রথমে অনেকে টের পান নি। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে বোঝা গিয়েছিল যে নতুন সরকার স্থানীয় গণতন্ত্রের প্রসার চান না। যতটুকু প্রসার হয়েছে, তারও বিলুপ্তি চান এবং সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান এম.এল.এ, এম.পি সহ আমলাতন্ত্রের একটা এলিট গোষ্ঠীকে। পূর্বতন সরকারের আমলে বিকেন্দ্রীকরণের পূর্ণ বিকাশ না হলেও বেশ কিছুটা অবশ্যই হয়েছিল। যার ফলে তাদের আমলের স্থানীয় শাসনকে অন্তত আংশিক পঞ্চায়েতী রাজ বলা চলে। কিন্তু পরবর্তীকালে যা হল তাকে বলা যায় আমলারাজের প্রত্যাবর্তন। শাসনব্যবস্থার এত বড় যে পরিবর্তন ঘটল তা নিয়ে কোনও প্রতিবাদ আসল না, না সুশীল সমাজে, না গণমাধ্যমে। দুইজন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এ কথাও বলে বসলেন এটা নাকি এক বিশাল প্রশাসনিক সংস্কার।

পঞ্চায়েতী রাজের সবচাইতে বড় আঘাতটি আসে নির্বাচন প্রক্রিয়ায়। প্রথমত রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের পদটির অবমূল্যায়ণ ঘটানো হয়। যাকে এই পদে বসানো হয় তিনি যদি নিরপেক্ষভাবে নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে নির্বাচন পরিচালনা করেন, তাহলে তাঁকে পদে পদে রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়, যেমনটা হয়েছিল ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তদানীন্তন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে। ফলে যাঁরা ঐ পদে আসীন হন, তাঁদের দেখা গেছে শাসক দলের অনুগত হয়ে কাজ করতে। দ্বিতীয়ত নির্বাচন এখন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ২০১৮ সালে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হল, তা যে নির্বাচনী অপরাধের চরম নির্দশন - একথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। এই নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে দেওয়া হয় নি, যাঁরা মনোনয়ন পত্র দিয়েছিলেন তাঁদের নির্বাচনী প্রচারের সময় সন্ত্রাসের মুখে পড়তে হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে এবং এমনকি গণনা কেন্দ্রে নানা

ধরণের বেআইনি কার্যকলাপ চলেছে অবাধে। সবার চোখের সামনে এসব ঘটনা ঘটেছে। এইরকম নির্বাচনের মাধ্যমে কোন ধরণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। তাই অনেকে যখন আমপানের ত্রাণের টাকা চুরি করা নিয়ে হৈ হট্টগোল করছেন, তখন দুঃখিত হতে হয় অবশ্যই, কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। শুধু একথা বলাই যথেষ্ট যে সংবিধান বলে বলীয়ান হয়ে বাংলায় এখন পঞ্চায়েত জীবিত আছে বটে, কিন্তু তার আত্মা তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

তারপর কি?

বর্তমান বাংলায় পঞ্চায়েতী রাজের যে হাল, তেমনই অবস্থা কি অন্যান্য রাজ্যেরও? পঞ্চায়েতকে স্বশাসিত এবং ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে কেরালার রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা আর অন্য কোনও রাজ্য নেয়নি। অটোনমির প্রশ্নে বাকি সব রাজ্যের পঞ্চায়েতের একই অবস্থা অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বে একটি সংস্থা হিসেবে। এই ব্যবস্থায়ও উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে মানুষ কিছুটা অংশগ্রহণ করতে পারে যদি তাতে রাজ্য সরকারের অনুমোদন থাকে এবং সেখানে গ্রামসভা এবং ওয়ার্ড সভা নামক প্রতিষ্ঠানগুলি চালু রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু এইটুকুও রাজ্য সরকারের ইচ্ছাধীন। সব রাজ্যে তা হয় না, যেমন বাংলায় এখন হয় না। এইসব নানা কারণে সারা দেশে পঞ্চায়েতী রাজ এখন সঙ্কটের মধ্যেই আছে। তাহলে পঞ্চায়েতের ভবিষ্যৎ কি?

পঞ্চায়েতী রাজের ভবিষ্যত গণতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। এই মুহূর্তে দেশে দেশে, ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়, ডানপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের প্রাবল্য, উদারপন্থার পিছু হটা এবং 'নির্বাচিত' স্বৈরাচারীদের উত্থান দেখার পর গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েই শঙ্কা হয়। গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন হবে আগামী দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। সেই আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই লড়াইয়ের সাথে যদি পঞ্চায়েতী রাজের সংস্কারের প্রশ্নটি যুক্ত করতে পারা যায়, তাহলে হয়ত পঞ্চায়েত নিয়ে এখনও কিছু আশা করার থাকবে। তবে একথা ঠিক পঞ্চায়েতকে বাদ দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন কিছুতেই সম্ভব হবে না।

****

শ্রদ্ধায় ও স্মরণে

মহঃ সেলিম

জন্ম : ২৩.০৭.১৯৫৪

মৃত্যু : ০১.০৭.২০২০

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ইমসের দীর্ঘদিনের নিরলস কর্মী মহঃ সেলিমের প্রয়াণে, আমরা সমাজসেবায় নিবেদিত প্রাণ এমন একজন সমাজকর্মীকে হারালাম, যার অভাব সবাই চিরকাল বোধ করব।

বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত সরডাঙা গ্রামে মহঃ সেলিমের জন্ম ১৯৫৪ সালে। তিনি, বাবা মহঃ সাকেব ও মা সাজিদা বেগমের প্রথম সন্তান। শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি তিনি গ্রামেই কাটান। স্থানীয় বিদ্যালয়ে, কলেজে শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন আর সমাজসেবা তথা মানুষের ক্ষমতায়নের রাজনীতির পাঠ তিনি পান তাঁর পরিবার থেকেই; যে পরিবারের একটি শাখা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দিয়েছিল কমরেড আব্দুল হালিমের মতন একজন পথিকৃৎ।

যৌবনের শুরুতেই শ্রী বিপ্লব হালিমের অনুপ্রেরণায় মহঃ সেলিম সামাজিক কাজে সক্রিয় ভাবে যোগদান করেন। তার পরে বিগত তিন যুগেরও বেশী সময় জনসেবায় তাঁর নিরলস ও নির্ভীক প্রয়াস, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। দরিদ্র কৃষকদের জমির ন্যায্য দাবি থেকে শুরু করে সামগ্রিক গ্রামোন্নয়নের কাজে, গ্রামস্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে, প্রথম সারির

সমাজকর্মী হিসাবে তাঁর অবদান সবাই মনে রাখবেন। নিরহংকারী, সদালাপী মহঃ সেলিম আন্তরিকভাবেই গণতন্ত্রে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আজ যখন সমাজসেবা এই প্রজন্মের অনেকের কাছে নিছক এক পেশায় পরিণত, তখন মহঃ সেলিমের মতন মানুষদের দৃষ্টান্ত আরো বেশি করে তাদের সামনে তুলে ধরা কর্তব্য, যিনি সরকারি চাকরি ও তথাকথিত সুখী ভবিষ্যতের ডাককে অগ্রাহ্য করে মানুষের কাজে আত্ম নিবেদনকেই নিজের জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন।

বেশ কিছু মাস রোগাক্রান্ত থাকার পরে, মহঃ সেলিম ১লা জুলাই, ২০২০-তে ইমসের লাভপুর ক্যাম্পাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহঃ সেলিম আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু সারা জীবন তিনি যে শোষণ বিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার রূপায়ণকল্পে ইমসের কাজে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন ইমসের সহকর্মীরা সযত্নে সিঞ্চিত করবে, এই প্রতিজ্ঞাই তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ইমসে

১৯৫, যোধপুর পার্ক

কোলকাতা -৭০০ ০৬৮

তাং - ০৩/০৯/২০২০

সংকল্প

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের
২০১০ মাধ্যমিকের প্রাক্তনীদের একটি উদ্যোগ

প্রায় দেড়শো দিন আগে শুরু হয়েছিল একটা আগন্তুক ঘরবন্দি জীবন, সঙ্গী হয়েছিল ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচার। বিশ্বব্যাপী এই অতিমারীর যাবতীয় তিক্ততার মাঝেও শাপে বর হল - স্কুল পাশের এক দশক পূর্তির একটা পুনর্মিলনীর রোজনামচা। হ্যাঁ, এখানে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের ২০১০ মাধ্যমিকের প্রাক্তনীদের কথা বলা হচ্ছে।

এই আপাত-অলস দিনযাপনের মাঝেই জন্ম 'সংকল্প'-এর। খবরে বা চোখের সামনে দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষগুলোর কাজ হারানো অসহায় মুখগুলো, তাদের ছোট ছোট সন্তান বা বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের না খেতে পাওয়া মুখগুলো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে দেয়নি 'সংকল্প'কে। শুরু হয় ফান্ড রেইজিং, প্রস্তুতিপর্ব। করোনার এই মৃত্যু উপত্যকায় এরপর আছড়ে পড়ল আমফান। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মানুষ পেটের ভাতের সঙ্গে হারালো মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও। অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেল 'সংকল্প'। আজ প্রায় দেড়শো দিন পেরিয়ে গিয়েছে, বরানগর, দক্ষিনেশ্বর, বেলঘরিয়া, খড়দহ পেরিয়ে দক্ষিণের রায়দিঘী থেকে উত্তরের সন্দেশখালি হয়ে

মধ্যমগ্রাম; মাত্র মাস কয়েকের যাত্রাপথে 'সংকল্প' সফলভাবে ছুঁয়েছে বহু মানুষকে। মোট ৬টি পর্যায়ে দুই ২৪ পরগণার প্রায় ২০০০ পরিবারের কাছে আনুমানিক ৬.৬ লক্ষ টাকার খাদ্যসামগ্রী, ঔষধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পৌঁছাতে পেরেছে 'সংকল্প'। শুধুমাত্র ভিন্ রাজ্য নয়, আর্থিক সাহায্য এসেছে সুদূর আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও কানাডার মত দেশ থেকে।

দুর্ভাগ্যবশত, এই অতিমারী তাদের অনির্দিষ্টকালের অনভিপ্রেত সঙ্গী, যার রোষ হয়তো পড়তে চলেছে বাঙালির বহু প্রতীক্ষিত দুর্গা পুজোতেও। এইবারের পুজো অন্যান্য বারের চেয়ে অনেকটাই আলাদা হতে চলেছে। সংকল্প-এর পরবর্তী লক্ষ্য সেই মানুষগুলো, যারা বছরের এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করে থাকে ভালো রোজগারের জন্য, যেমন - ঢাকি বা মৃৎশিল্পীরা। উৎসবের দিনগুলোতে তারাও যেন নতুন জামা গায়ে পেট ভরে দু'টো ভাত খেতে পায়। নিজের ভাগের একটা জামা কম কিনে যদি ওদের জন্য সেই টাকাটুকু বরাদ্দ করা যায় - এই পুজোয় এটাই 'সংকল্প'-এর বার্তা।

সংকল্পের তরুণদের এই সাধু উদ্যোগকে আমরা সম্মান জানাই।

****

শ্রী খোকন মন্ডল

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও শ্রী খোকন মন্ডলকে নিঃস্বার্থ সমাজসেবার থেকে দূরে রাখতে পারে নি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে দরিদ্র পরিবারের শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। শ্রী খোকন মন্ডল Social Work-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন (MSW) ও নিজের শিক্ষাকে নিছক ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজসেবার লক্ষ্যে তাকে কাজে লাগানোর জন্য গঠন করেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'মঠেরদিঘী পল্লী সেবা সদন'।

এই সংগঠনের মাধ্যমে শ্রী মন্ডল একাধিক সামাজিক কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছেন। কৃষি, সচেতনামূলক কাজ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সুন্দরবনের মানুষের বিকল্প জীবিকা, ভার্মিকম্পোস্ট, মাশরুম তৈরি ইত্যাদি কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রী খোকন মন্ডলের জীবনের শুরুটা ছিল আর পাঁচটি ছেলেমেয়ের থেকে অনেক বেশী কঠিন। তিন বছর বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে ডান পায়ে ক্র্যাচের উপর ভর করে তাঁকে চলাফেরা করতে হয়। তিনি ৭০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে দারিদ্রতার সঙ্গে বেড়ে ওঠেন। সেই সময় থেকেই দারিদ্রতা, কৃষকের যন্ত্রণা, প্রত্যন্ত গ্রামে চিরাচরিত সমস্যা খুব কাছ থেকেই তিনি অনুভব করেছেন। পরে তার শৈশবের স্মৃতি সামাজিক কাজে তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

২০২০ সালে সারা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশ ও রাজ্যেও করোনা অতিমারীর ভয়ানক বিপর্যয় ঘনিয়েছে। সুন্দরবনবাসীদের জন্য এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছে সুপার সাইক্লোন আমফানের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। ফলে দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ মানুষজন আজ মহাসংকটে। জীবিকা থেকে শুরু করে খাদ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা এমনকি সুন্দরবনের বেশ কিছু অঞ্চলে বাসস্থানেরও বেহাল অবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে শ্রী খোকন মন্ডল ও তাঁর সংগঠন মানুষের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন

সাহায্যের হাত। বিশেষতঃ শিশুদের, প্রসূতি মা, অসুস্থ ও দুঃস্থ মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সাহায্য। যেমন ১৫০ জন অসহায় শিশুদের বাড়িতে বাড়িতে বিশেষভাবে তৈরি প্যাকেট বেবিফুড পৌঁছে দেওয়া, আরও ৪০০ জন শিশুকে দুধ ও হরলিক্স প্রদান, ৫০ জন প্রসূতি মায়েদের হাতে নগদ ৫০০ টাকা ও নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া এবং ২০ জন অসুস্থ ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের নগদ ৫০০ টাকা ও নিত্য প্রয়োজনীয় ১ মাসের খাদ্য সামগ্রী প্রদান। সন্দেশখালি, গোসাবা, ক্যানিং-১, কুলতলি, বাসন্তী, জয়নগর ও বারুইপুর ব্লকের ৫০০০-এর বেশী পরিবারকে নিত্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে তাঁর সংগঠন।

শ্রী খোকন মন্ডলের নিঃস্বার্থ সমাজসেবার প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য।

****

শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ী

করোনা অতিমারীর প্রকোপে যখন দেশ তথা রাজ্যের মানুষ বিপন্ন, তখন প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র মানুষের পাশে, বিশেষতঃ মহিলা ও শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ী ও তাঁর সংগঠন ডঃ নিখিল বিহারী মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন এবং ইলসোবা শ্রী হরি প্রসাদ গোস্বামী স্মৃতি সমিতি। কলকাতার বস্তির করোনা আক্রান্ত এলাকায় খাদ্য সামগ্রী ত্রাণ, স্যানিটাইজেশন, সুরক্ষা কিট এবং মুখোশ সরবরাহ করেছেন তিনি ও তাঁর সংগঠন।

শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ীর সমাজসেবার শুরু ছাত্রী জীবনেই। এরপরে কর্মজীবনেও তিনি একজন সমাজকর্মী হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেন। মহিলা সমিতি পরিচালনা করা, মহিলাদের শিক্ষা (প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদেরও), স্বাস্থ্য, জীবিকা তথা শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে নানাভাবে সচেতন করা ও সাহায্য করা, সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ীর উদ্যোগে হুগলী জেলার গোনাই গ্রামে প্রি-প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সামাজিক কর্মকান্ডে প্রমিতা দেবীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান মাদার অ্যান্ড চাইল্ড (IIMC, Sonarpur)। বিগত ১০ বছর ধরে IIMC প্রমিতা দেবীর উভয় সংগঠনকেই সাহায্য করছে তাদের নানান কাজের বাস্তব রূপায়ণে।

শ্রীমতী ভাদুড়ী একজন প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্ট এবং ন্যাশানাল AIDS কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, ভারত সরকার দ্বারা আয়োজিত HIV সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পরামর্শদাতা। তিনি দক্ষিণ কলকাতার একটি শীর্ষস্থানীয় ডায়াগনস্টিক সেন্টার (১৯৮৪)-এর একজন স্বত্বাধিকারী ও উদ্যোক্তা।

সমাজসেবায় তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এখনও তাঁর নিত্য দিনের পাথেয়। তিনি ভবিষ্যতেও তাঁর এই সেবা ব্রতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ীর একনিষ্ঠ সমাজসেবার প্রতি জানাই আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য।

****

“আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপমান মনে করি।”

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশনা : ইমসে, ১৯৫ যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৮
ফোন : ০৩৩-২৪৭৩২৭৪০
ই-মেল: **bipimse@hotmail.com / bipimse1974@gmail.com**